Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 445 – 453
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতি সমন্বয়ে ইসলাম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের সপ্ত কালীক্ষেত্র

নম্রতা দত্ত
মুক্ত গবেষক
Email ID : nupurdutta00869@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Azan, Conch shell, Tantric, Harmony, The peak, Musque, Sanctum sanctorum, Brahmamayi, Knowledge, Kalikshetra.

Abstract
Murshidabad is a very important district of West Bengal. A district where dawn breaks through the combined sounds of temple bells, Mosque Azan, Gurudwara prayer chants. So far, the history of district refers to the battle of Palashi, the friendship of Mohanlal, Alaverdi's love for Siraj. The main complaint against Muslim-dominated Murshidabad is the lack of harmony among the people of the district. There are more mosques than temples in the district. But, if you look like a deeper, you can see that there are many temples like Dohaliya Kalibari, Kriteswari Kalibari, Tatatani Kalibari, Pataleswar Shiv Mandir, Joy Kalibari, Preshnath Jain Mandir, Patal Kalibari, Laxmi-Narayan mandir etc around the district. It can be seen that the number of Kali Mandir is relatively high. Kripamayi Kalibari, Brahmamayi Kalibari, joy Kalibari, Karunamayi Kalibari, Dayamayi Kalibari, Dohaliya Kalibari, Kriteswari Kalibari- The architecture of these seven Kali Mandir's is eye-cathing. When seen from a distance, especially the peaks of the temple, they are mistaken for mosque domes. Not only that, from worshiping, vowing to the g0ddess to developing the temple, people of both Hindu and Islamic communities work together. In addition to Hindus, Muslims also voluntarily participate in the various festivals held around the temples. All hindus and Muslims are children of Goddess. As a result, the temple became a symbol of all religions. As the Kalikshetra of Murshidabad, which is said to be a secular India, these seven Kali temples are a symbol of that religion and culture. Although this matter is very important in the history of religion and culture of India, it has not yet come under the foot lamp of history. In the eyes of the metropolis, Murshidabad is a backward and almost illiterate region. But these seven Kalakshetra's of Kripamayi Kalibari, Brahmamayi Kalibari, joy Kalibari, Karunamayi Kalibari, Dayamayi Kalibari, Dohaliya Kalibari, Kriteswari Kalibari of this seemingly backward district set a unique example of human bonding and gained an important place in the pages of history.

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume-3, Issue-Iv, October 2023, tirj/October23/article-51
Website: https://tirj.org.in, Page No. 445-453
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক জেলা মুর্শিদাবাদ। ভাগীরথীর দ্বারা দ্বি-বিভাজিত এই জেলার পূর্বাংশ বাগড়ি ও পশ্চিমাংশ রাঢ় নামে পরিচিত। আপামর বাংলাবাসী ও ইতিহাসের কাছে মুর্শিদাবাদ মানেই মূল আকর্ষণ সিরাজ-উদ-দৌল্লা, হাজারদুয়ারী, জগৎশেঠের বাড়ি, তাঁর বাড়ির লক্ষীদেবী নিয়ে জনশ্রুতি, নিমতিতা রাজবাড়ি থেকে শুরু করে সিল্কের শাড়ি, খাগড়াই কাঁসা, শোলা শিল্প, গজদন্ত শিল্প, রেশমশিল্প, বিড়ি শিল্প, সাগরদীঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র। জেলার ইতিহাস বলতে গুরুত্ব পায় 'পলাশী যুদ্ধ'-র বকলমে ইসলাম ইতিহাস। অতি সাম্প্রতিককালে শিকড়কে জানার টানে মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন বিলুপ্তপ্রায় লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক অন্বেষণ শুরু হয়েছে। যার মধ্যে সবিশেষ আকর্ষণ আলকাপের মত লোকনাট্য, বোলান-ভাদুর মত লোকগীতি, খেটে-বৌ তোলাতুলির মত লোকক্রীড়া, রাঁয়বেশের মত লোকনৃত্য সম্পর্কিত। এই সম্পর্কিত গবেষণা চলার পাশাপাশি আধুনিক জনমানসে এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তুলতে জেলাসদর থেকে গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন মনোগ্রাহী অনুষ্ঠান আয়োজিত ও সমাদৃত হয়। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বরাবর ইতিহাসের দৃষ্টি এড়িয়ে যাচ্ছে। ইসলাম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রাচীন ঐতিহাসিক শহর মুর্শিদাবাদের আনাচে-কানাচে খোঁজ মেলে খাগড়ার জয়কালীবাড়ি, খাগড়ার ছোট ও বড় জগন্নাথবাড়ি, গোপালঘাটের পাতালেশ্বরকালী, সৈদাবাদের দয়ানগরে নবরত্ন মন্দির, টানাটানির কালীমন্দির, দয়াময়ী কালীবাড়ি, কাশিমবাজারের পাতালেশ্বর, আনন্দময়ী কালীবাড়ি, কৃপাময়ী কালীবাড়ি, ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ি, ব্যাসপুরের কপিলেশ্বর শিবমন্দির, বিষ্টুপুরের করুণাময়ী কালীবাড়ি, কান্দির দোহালিয়া কালীবাড়ি, জজানের সোমেশ্বর ও সর্বমঙ্গলা মন্দির, শাবলদহ কালীমন্দির, বড়হকোণা বৌদ্ধবিহার, দক্ষিণাখণ্ড ধীরজতলা আশ্রম, বানোয়ারীজীর মন্দির, জিয়াগঞ্জের কিরীটেশ্বরী মন্দির, ডাহাপারা জগৎবন্ধু মন্দির, লালবাগের কাঠগোলা বাগানবাড়ির পরেশনাথ মন্দির, আজিমগঞ্জের বড়নগরে চারবাংলা মন্দির, সাহোড়ার সংকেটশ্বরী মন্দির, বড়এঞার মদনেশ্বর শিবমন্দির, যুগেশ্বরার শিবমন্দির, বেলডাঙ্গার বৌদ্ধদেবী ডুমনীদেবী প্রমুখ। আরও গভীরে দেখলে দেখা যায় মুর্শিদাবাদে হিন্দু-দেবস্থানের মধ্যে কালী মন্দিরের সংখ্যা একটু হলেও বেশী। কলকাতার ন্যায় মুর্শিদাবাদও কালীক্ষেত্রই বটে। এই কালীবাড়ীগুলির মধ্যে ভক্তদের নিকট জনপ্রিয় সপ্তকালীবাড়ী অর্থাৎ কৃপাময়ী কালীবাড়ী, ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ী, জয়কালীবাড়ী, করুণাময়ী কালীবাড়ী, দয়াময়ী কালীবাড়ী, দোহালিয়া কালীবাড়ী, কিরীটেশ্বরী কালীবাড়ী গোড়াতেই হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতি সমন্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু ইতিহাস এই সম্পর্কে নীরবই বলা চলে। সুতরাং ইতিহাসের এই অনালোকিত দিকটির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে।

সহজ অর্থে ধর্ম বলতে বোঝায় পবিত্র স্থান-বিশ্বাস, যা অপরকে মর্যাদা দিতে শেখায়। শিল্প-র সাথে দেশের অর্থনৈতিক মান ওঠানামা জড়িত। সংস্কৃতি অর্থাৎ নম্রতা-মান-নৈতিকতা যা ব্যক্তি-সমাজ-দেশের আচারণের মধ্যে প্রকাশ্য। আপাতদৃষ্টিতে আলাদা মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা এক সূত্রে গাথা— মানবশক্তি। যা প্রমাণ করতে বেছে নেওয়া হল মুর্শিদাবাদের সাতটি কালীমন্দিরকে। বিভিন্ন শিল্পকলার মধ্যে আকর্ষণীয় পবিত্র শিল্প বা কলা মন্দির। তত্ত্বদর্শনের অন্যতম অঙ্গ মন্দির এমন এক পরমতত্ত্ব যাকে কোনো দেহ বা ব্যক্তি হিসেবে কল্পনা করলে বলা যায়, এই পরমতত্ত্বই 'বাস্তুপতি', মন্দির তাঁর 'বাড়ি' এবং তিনিই নেমে আসেন গর্ভগৃহের 'বিগ্রহপ্রতীক' হিসেবে।[১] শিল্পশাস্ত্রানুসারে, আরাধ্যার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য স্ব-বিশ্বাসনুসারে ধর্মাচরণের পাশাপাশি শিল্প-স্থাপত্য-ভাস্কর্য-এর প্রতি মননশীলতা আধ্যাত্মিকতার আরেক অঙ্গ। এর জন্য চাই অর্থ। সমাজ চালানোর ছড়ি বকলমে বিত্তশালীদের হস্তগত হওয়ায় প্রাথমিকবস্থায় ধর্মাচরণ ও মন্দির গাত্রে অনুসাঙ্গিক শিল্প-ভাস্কর্যও ভূ-স্বামীদের মর্জি-মাফিক মন্দিরগাত্রে ফুটে উঠত ও এর উপর তাঁদের আর্থিক আশীর্বাদও বজায় থাকত। অনুমিত, ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রসারের গতি রুখতে ব্রাহ্মণ্যবাদ হিন্দুধর্ম প্রসারের মাধ্যম হিসেবে মন্দির গাত্রে শিল্প-ভাস্কর্য ফুটিয়ে তুলতে ও দেবমূর্তি অলঙ্করণকে হাতিয়ার করে।[২] লক্ষণীয় প্রাকবৈদিক যুগ থেকে এদেশে হোমের অগ্নিশিখা হিসেবে স্ত্রীশক্তি তথা মহাশক্তি গণ্য হন।[৩]

যাই হোক, মুর্শিদাবাদের আঁতুড় ঘরে গেলে দেখা যায় জন্মলগ্নে যখন জেলার ভাগীরথী-ব্রাহ্মণী-বাঁশলই প্রভৃতি নদীর কিনারা ধরে আর্য সভ্যতার বিকাশ ঘটছিল সেসময়েই আবার হিন্দুধর্ম ও পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটে।[৪] এমনকি হিউয়েন-সাঙ সপ্তম শতকে মুর্শিদাবাদে এসে কর্ণসুবর্ণ ও পাঁচথুপির 'বারকোনা' বৌদ্ধবিহার পরিদর্শন করেন।[৫]

আবার চৈতন্যকালে বৈষ্ণবধর্মের প্রসার এবং তেরো শতক থেকে ইসলামের পদধ্বনি শোনা যায়। সুতরাং গোড়াতেই জেলায় হিন্দুধর্মের আগমন ঘটে। স্বাভাবিকভাবে তার সাথে আগমন ঘটবে হিন্দু মন্দির ও সহউপানাদি।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে হিন্দু মন্দির নির্মাণ শৈলীর ক্ষেত্রে নাগর, দ্রাবিড়, বেসররীতি অনুসৃত হয়। তারমধ্যে বাংলায় প্রায়ক্ষেত্রেই অনুসৃত হয় রেখদেউল, পিড়দেউল বা ভদ্রদেউল এবং শিখর দিয়ে ঘেরা ভদ্রদেউল- এই তিন বৈশিষ্ট্যযুক্ত নাগররীতি। প্রাক-মুসলিমপর্বে বাংলায় প্রথম দুই রীতির যেমন দেখা মেলে। লক্ষণীয় তৃতীয় ধারানুসারে বাংলায় বহু মসজিদ নির্মিত হয়েছে, মুর্শিদাবাদও তার ব্যতিক্রম নয়।

বিস্তৃত ভিত্তিভূমির উপর সমস্ত দিকগুলিকে নিদিষ্ট বিন্দুভিমুখ করে কেন্দ্রস্থলে মন্দিরের গর্ভগৃহ নির্মিত হয়। মূলত প্রাচীন বহু পৌরানিক কল্পকথার সাথে সঙ্গতি রেখে সংস্কার-বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মন্দিরের গঠনবিন্যাস ঘটে। উত্তর ভারতীয় মন্দিরগুলি শুরুর দিকে স্তম্ভযুক্ত বর্গাকার মণ্ডপ ও সমতল ছাদবিশিষ্ট হলেও পরবর্তীতে স্তম্ভ বা খিলানযুক্ত মণ্ডপ আকারে বেড়ে সভাকক্ষ-এ পরিণত হয়, যা আরও পরে আড়াআড়িভাবে ও পার্শ্বিকভাবে বায়ু চলাচলের জন্য নির্মিত হয় যথাক্রমে গর্ভগৃহ-সভাকক্ষয়ের মাঝে গলিপথ ও প্রদক্ষিণ পথ।[৬] দক্ষিণ ভারতীয় মন্দিরের ক্ষেত্রে প্রাকার ঘেরা দ্বারপথের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মহাদ্বার বা গোপুরম প্রস্তুত হত। গর্ভগৃহের মূল দেব-দেবীর মূর্তির পাশে কুলঙ্গিনীতে অন্য দেবদেবীর মূর্তি থাকত।

এ তো উত্তর-দক্ষিণ দিকের ব্যাপারস্যাপার। বাংলার নিজস্বতা কি? দেখা যায় গ্রাম-বাংলার শিল্পীরা স্যাঁতস্যাঁতে আবহাওয়ার সাথে সঙ্গতি রেখে মৃত্তিকা গাত্রের উপর খড়, তালপাতা দিয়ে চালা নির্মাণ করতেন। যা বিদেশী শাসকদেরও সবিশেষ আকৃষ্ট করে। তবে চালারও কয়েকটি ভাগ বর্তমান। যেমন - একচালা, দোচালা, চারচালা, আটচালা, বারোচালা। উল্টানো নৌকাকৃতির চালা, যার দুটি প্রান্তদেশ একটি রেখায় মিলিত হয়ে উপরিভাগে ধনুকাকৃতি সৃষ্টি করে দো-চালা। আবার জোড়বাংলার ক্ষেত্রে পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে থাকা দুটি উল্টানো নৌকাকৃতির ছাদ ও ছাদের মাঝবরাবর অষ্টকোণী বা বহুভোজী উঁচু স্তম্ভ থাকে ও মন্দিরগুলোর সামনে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশদ্বার ও বিগ্রহের বেদীর সামনে একটি প্রবেশদ্বার থাকে ও প্রতি ছাদে তিনটি চূড়া বর্তমান।[৭] পূর্ববর্তি দোচালার পরিমার্জিত রূপ জোড়বাংলা। চারচালার এক্ষেত্রে মন্দিরের সম্মুখভাগে অলিন্দ, ধনুকাকার তিনটি প্রবেশকক্ষ, পার্শ্বকক্ষ দেখতে অনেকটা পিরামিডের মত। চারচালা মন্দির সাদৃশ্য এই মন্দিরের ক্ষেত্রে একটি অতিরিক্ত ক্ষুদ্রাকৃতি বিশিষ্ট ছাদ জোড়া লাগিয়ে মন্দিরের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়। ছিল আটচালা মন্দির। এক্ষেত্রে আটচালা প্রস্তুত হত চারটি বাঁকানো কার্নিশ সংযুক্ত ঢালু চালের উপর ছোট আকারের স্বল্প উচ্চতার খাড়া তুলে তার উপর চারটি চালের বিন্যাস ঘটানো হত।[৮] অন্যদিকে দেওয়ালের গাঁথুনি ও জটিলতর মুনশিয়ানা সাপেক্ষ ছাদের উপর নির্ভর করে পুবমুখী মন্দির নির্মিত হয়। এই ছাদের উপর থাকত Pendentive Dome' বা গম্বুজ। পরবর্তীকালে মন্দির-শিল্পীরা গর্ভগৃহের দুপাশে খিলান দিয়ে তার উপরে গম্বুজ নির্মিত করে ও পরবর্তীতে তাঁরা ইটের খোয়া, চুন-বালি-সুরকি দিয়ে গম্বুজের মূলাকার ঢেকে শিখর দিত। এই প্রযুক্তির ফলে খরচপাতী নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পাশাপাশি গর্ভগৃহটি ভিতর থেকে দেখলে এটি মন্দির না মসজিদ তা অনুমান করা দুষ্কর হয়। সেই সাথে গর্ভগৃহের দরজায় পশুপাখি-দেবদেবী ইত্যাদি খোদিত হত। এছাড়াও ছিল দালানরীতি অর্থাৎ বর্গাকারক্ষেত্রের উপর থাম ও অলিন্দযুক্ত মন্দির। মুর্শিদাবাদের মন্দির-শিল্পীরাও এর ব্যতিক্রম দেখান নি। যেহেতু জেলার বিত্তশালীদের দ্বারা মন্দির নির্মিত হত, সেহেতু মন্দির নির্মাণ কর্মে কোনোপ্রকার অর্থ-প্রতিকুলতা দেখা যায়নি। মন্দির ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পোড়ামাটির নকশা ফুটিয়ে তোলা হত। এক্ষেত্রে ধর্মীয় চিত্রগুলি ফুল-লতা দ্বারা বেষ্টিত থাকত, মূল কাঠামোর বিভিন্নাংশে ফুলকারি-নক্সা ও মন্দিরের নিম্নাংশে হাতি-ঘোড়া-হাঁস-ময়ূর প্রভৃতি অলংকৃত করা হত।

এবারে আসা যাক মুর্শিদাবাদের সদরে। বহরমপুর শহরের কোলাহল থেকে কিছুটা দূরে শান্তশিষ্ট সবুজে ঘেরা এলাকা কাশিমবাজারের ভাটপাড়ায় রয়েছেন দেবী কৃপাময়ী। মন্দিরটির অলিন্দ ও গর্ভগৃহ অষ্টভুজাকৃতির সমতল ছাদবিশিষ্ট। মন্দিরের তিনটি দরজা কারুকার্যবিহীন সেগুন কাঠের। গর্ভগৃহের চারিদিকে ঘুরানো বারান্দায় আর্চবিশিষ্ট মোট আটটি জানালা এবং গর্ভগৃহের সামনে-দুপাশের জানালা পিছনের দিকের জানালার তুলনায় কিছুটা নিচু। পিছনের জানালা দিয়ে দেখা মেলে পঞ্চমুণ্ডির আসন, সাধক ভাদু ঠাকুরের সমাধিসহ দুটি নরসমাধি জঙ্গলাকীর্ণবস্থায় রয়েছে।

গর্ভগৃহের অন্দরে প্রায় দুহাত উচ্চতাবিশিষ্ট আসনের উপর শায়িত শ্বেত শিবের উপর এগারোটি মুণ্ডমালা পরিহিতা দেবীর অধিষ্ঠান। দেবীর পিছনের দিকে এগারোটি লোহার দণ্ডবিশিষ্ট রয়েছে। দেবী পুজিত হন তান্ত্রিক মতে। দেবী আলোকিত হন লম্বা কাঠের মোমদানি দ্বারা। এই দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হন অনতিদূরে প্রবাহিত বর্তমান কাটিগঙ্গা যা পূর্বে মূল গঙ্গার সাথে যুক্ত ছিল সেই প্রবাহ থেকে হরেকৃষ্ণ হালদার কর্তৃক।[৯] রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর উদ্যোগে দেবীমূর্তি অধিষ্ঠিত হন মাটির ঘরে। সেসময়ে নিশিকালে কেনারাম ডাকাত এই দেবীর পূজা করতেন। তিনি পরবর্তী সময়ে বিহারে সরকার দ্বারা ধৃত হলে বিহারের ডাকাতরা এসে দেবীর অঙ্গহানি ঘটালে পুনরায় দেবীর অঙ্গরাগ হয়।[১০] এই মন্দির ছিল ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা, নেতাজী থেকে ঋষি অরিবিন্দর ছিল আনাগোনা।[১১] মূল মন্দিরে ঠিক সামনে প্রায় ৭ বছর আগে নির্মিত সমতল ছাদবিশিষ্ট নাটমন্দির বর্তমান যেখানে চড়কের সময় শিবভক্তরা বিশ্রাম নেন। এর ঠিক সামনে রয়েছে ত্রিকোণ চূড়াবিশিষ্ট প্রাচীন শিবমন্দির। যার অন্দরে শতাধিক প্রাচীন শিবলিঙ্গ অবিকৃতবস্থায় রয়েছে। তবে শিবমন্দির-নাটমন্দিরের মাঝখানে কাঠের জীর্ণ হাড়িকাঠ রয়েছে। যেখানে আজ থেকে কয়েকশো বছর আগে এই মন্দিরের মূলকাণ্ডারি সাধক রবি ঠাকুর সিদ্ধিলাভের জন্য প্রায় শতাধিক নরবলী দেন। ব্রিটিশ সরকার এই খোঁজ পেয়ে তাকে ধাওয়া করলে তিনি মূল বিগ্রহসহ পালিয়ে আশ্রয় নেন তৎকালীন জাহাজঘাটা অঞ্চল তথা সতীদাহ ঘাটের জঙ্গলে। সেখানে সতীদের দেহাভস্মের উপর মন্দির নির্মাণ করে দেবীর পূজা শুরু করেন। দেবীর নতুন নাম হয় আনন্দময়ী দেবী।[১২] মন্দিরটি মাটি থেকে প্রায় চার ফুট উঁচু, সমতল ছাদবিশিষ্ট দালানয়ালা এই মন্দিরের পিছনে রয়েছে সাধক রবি ঠাকুরের সমাধি। এখন প্রশ্ন তাহলে ভাটপাড়ার মন্দিরের পূজাবেদী কি শূন্য রইল? সেখানে আনন্দময়ীর আদলে নির্মিত হল কৃপাময়ী। যেন কৃপাময়ী-আনন্দময়ী যমজ বোন। এই মন্দিরের বিশেষত্ব হল এখানে দেবী পুরুষ-মহিলা উভয়েই পৌরহিত্য করেন। মন্দির প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত চড়ক উৎসবে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিত হয়ে উৎসব উপভোগ করেন। সেই সাথে চড়ক উপলক্ষে আয়োজিত মেলায় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিত হয়ে দৈনন্দিন এক ঘেয়েমি যেমন কাটান তেমনি উৎসবের বাতাসে ব্যক্তিগত উস্মাগুলোকে চাপা দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। শহরের বাইরে প্রায় অ-জনপ্রিয় কৃপাময়ীমন্দির প্রাঙ্গণ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির। এই একটি ঘটনা প্রমাণ করে উৎসব কারো একার নয় উৎসব সবার।

ইতিহাসের পাতায়, পর্যটকদের নিকট কাশিমবাজার মানেই ছোটরাজবাড়ীর দুর্গাপূজা ও ভগ্নপ্রায় বড় রাজবাড়ীর জীবদ্দশা ফেরানোর প্রচেষ্টা। কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন বড় রাজবাড়ী সংলগ্ন সমতল ছাদবিশিষ্ট ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ী। এখানে দেবীর রূপ দুর্গা। একসময়ে যে মন্দির প্রাঙ্গণে বিশ্বকবির পদধূলি পড়েছিল আজ সেই প্রাঙ্গণসহ গোটা মন্দির স্থানীয় হিন্দু-ইসলাম মানুষদের আর্থিক সহায়তায় নবরূপ দেওয়া হচ্ছে। এর কিছু দূরে বানজেঠিয়াতে অবস্থিত ব্রহ্মময়ী কালীমন্দিরে দেবীকালী প্রায় উলঙ্গিনী। দেবাদিদেবের স্থান এখানে দেবীর পদতলে নয় দেবীর পাশে, দেবীর বাহন রাজহংস। দেবীর ব্রহ্মময়ীরূপ যেন বার্তা দেয় তিনি আদি-অনন্ত-অসীম, সমস্ত জ্ঞান-বিবেক-বুদ্ধি-বোধ তার মধ্যে সমাহিত। এই জ্ঞান-বোধ কোনো বইয়ের পাতায় নয় পাওয়া যাবে বাস্তবের জমিনে। যার নজির হয়ত পাওয়া যাবে বটঝুড়ির নীচে চাপা পড়া গম্বুজাকৃতির চূড়াবিশিষ্ট মন্দিরের সমতল ছাদবিশিষ্ট নাটমন্দির প্রাঙ্গণে। যেখানে দেখা মেলে ভিনধর্মী মানুষ পুরোহিতের সাথে দৈনন্দিন কথা সারছে, হিজাব-বোরখা পরিহিতারা নিশ্চিন্তে নাটমন্দিরে বসে তাঁদের পরীক্ষার পড়া ঝালাই করছে, খাবার খাচ্ছেন।

কোনো এক নাম না জানা তান্ত্রিক বহু বছর আগে নিজ হাতে একচালার ছাউনি প্রস্তুত করে তাতে পঞ্চমুণ্ডির আসনে প্রায় দেড় বিঘৎ উচ্চতার এক কালীমূর্তি স্থাপন করে তান্ত্রিক মতে পুজা শুরু করলেও আচমকা তিনি অনন্তকালের জন্য নিরুদ্দেশ হন। এরপর এলাকাবাসীরা মিলিত হয়ে ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী দ্বারা মহাকালীর বর্তমান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে যে পূজা শুরু করে তা আজও চলে আসছে।[১৩] বর্তমান পুরোহিতদের তত্ত্বাবধানে দেবীমূর্তির অঙ্গসজ্জা অনেকটাই দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর ন্যায়। দিনের সাথে মন্দিরের গঠনশৈলীর পরিবর্তন চোখে পড়ার মত। খড়ের একচালা ছাউনির মন্দির থেকে সমতল ছাদসহ বিশাল নাটমন্দির বিশিষ্ট এরূপ কালীমন্দির জেলায় প্রায় খুঁজে পাওয়া ভার। মন্দিরের ঠিক গর্ভগৃহের উপরে ত্রিরত্ন বিশিষ্ট গম্বুজাকৃতির চূড়া রয়েছে। দূর থেকে দেখলে মসজিদের চূড়া বলে

ভ্রান্তি লাগে। ১৩২৬ সালে ভরদ্বাজ গোত্রীয় আশুতোষ শর্মা দ্বারা সংস্কার সাধিত[১৪] এই মন্দিরের আরেকটি আকর্ষণীয় জিনিস মন্দিরের সদর দরজার উপরিভাগে তিনটি দারয়ালা আরেকটি চূড়া বর্তমান যেটি পিছন থেকে দেখলে কোনো মসজিদের তোরণ বলে ভ্রান্তি লাগে। প্রাচীন এই কালীবাড়ি ছোট ইট-বালি-সুড়কি দ্বারা নির্মিত হলেও কালের নিয়মে তা ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হলে ভক্তবৃন্দের আর্থিক আনুকূল্যে কালীবাড়ির সমগ্র ভবনটি ভেঙে নতুনরূপে নতুনভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এই কালীবাড়ীর সাথে বিশেষভাবে জড়িয়ে রয়েছেন গোরাবাজার শ্মশানঘাট এলাকার বাসিন্দা ওয়াজিদ হুসেন সাহেব। তিনি মন্দির পুনর্নির্মানের নিমিত্তে বিরাট অঙ্ক দান, ইলেকট্রিক দ্রব্যাদি দান করার পাশাপাশি তিনি স্ব-ইচ্ছায় মন্দিরের নিত্যপূজার জন্য রাধা-মাধব দানসহ, বিগ্রহের সমস্ত অঙ্গসজ্জা দান করেন। শুধু তিনি এতেই থেমে থাকেন নি-তিনি নিত্য কালীবাড়ীতে দেব-দেবীর দর্শনে আসেন, ভক্তিভরে আরতি ইত্যাদি পূজার বিভিন্ন আচার দর্শন করে প্রণাম করেন ও পূজা শেষে চরণামৃত গ্রহণ করেন।

মুর্শিদাবাদের সদর শহর বহরমপুর থেকে অনতিদূর বিষ্টুপূর-এ মা করুনাময়ী কালীবাড়ি। এই দেবীর কাহিনীর সাথে এলাকার মানুষের আবেগ ব্যপকভাবে জড়িয়ে আছে। তৎকালীন নবাব সরফরাজ খানের কাছে কৃষ্ণনন্দ হোতা নামে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ কাজের খোঁজে আসেন। পরবর্তী সময়ে তাঁর করুণাময়ী নামে কন্যাসন্তান হয়। আজ যেখানে মা করুণাময়ীর কালীবাড়ি সেখানেই পূর্বে মহাশশ্মান ছিল। কাশিমবাজারের মহারাজার অধীনস্থ এই গোমস্তা তাঁর কন্যাকে নিয়ে নিত্যদিন এই পথ ধরে তাঁর সৈদাবাদের কাছারিতে যেতেন ও ফেরার সময় এই মহাশশ্মানে ধ্যান করতেন। একদিন ঘটনাচক্রে কন্যাকে এই স্থানে এক শাঁখারির কাছে রেখে নিজে কাছারিতে চলে যান। ফিরে এসে দুজনের কাউকে খুঁজে পাননা ও আদুরে কন্যার নাম ধরে ডাকলে দেখেন পাশবর্তী বিল থেকে শাঁখা পরিহিত তাঁর কন্যার দুটি হাত দেখা দিল। কন্যা হারানোর শোকে তিনি এস্থানে কঠোর ধ্যান শুরু করলে দেবী তাঁকে মন্দির স্থাপন করার স্বপ্নাদেশ দেন। শোনা যায় এক নির্জন রাতে বন্ধ দরজার ওপারে এই দেবী স্বয়ং মাটি তলা থেকে কোমর পর্যন্ত উত্থিত হওয়ার পর জনৈক দরজা খুলে দেন ও দেবীর শরীরের বাকি অংশ ভূমির নিচে রয়ে যায়। এ সমস্তটাই লোকমুখে প্রচলিত। মূল ঐতিহাসিক ভিত্তি হল কাশিম বাজারের মহারাজার অধীনস্থ গোমস্থা কৃষ্ণ নন্দ হোতা এই কালীবাড়ি প্রতিষ্ঠা করেন। বিষ্ণুপুর বিলের ঠিকপাশেই অবস্থিত মন্দিরের একরত্ন বিশিষ্ট ঘটাকৃতির চূড়া দেখতে পাওয়া যায়। মন্দিরের গর্ভগৃহ-এ কারুকার্য খচিত বেদিতে দেবীর অবস্থান। দেবীর মাথায় রূপার ছত্রী। তার নিচে দেবীর বেদির উপরে রূপার পায়রার অবস্থান। দেবীর মূর্তিটি বিশেষ পাথর দ্বারা নির্মিত ও দেবীমূর্তিটি অন্যান্য কালীমূর্তির তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। দেবীর ভ্রু দুটি পিতলের। মাথায় রূপার মুকুট। মূল মন্দিরের চারিপাশে একটি নারায়ণ মন্দির আর দুটি শিব মন্দির বর্তমান। নাটমন্দিরের চারিপাশে দেবী কাম্যাখা, দেবী ধূমাবতী, দেবী মাতঙ্গি থেকে শুরু করে দশমহাবিদ্যার সকল রূপ সুদৃশ্য মূর্তি দ্বারা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আগে এর স্থানে কেবল দশমহাবিদ্যার আলাদা আলাদা ছবি ছিল। জেলা বাসীর বিশ্বাস, আজ এতবছর পরেও যাওয়ার দেবীর মাহাত্ম্য ও আশীর্বাদ তাঁর ভক্তদের উপর অকাতরে বর্ষিত হয়। এই দেবীকে দর্শন করতে আশেপাশের জেলা থেকেও উভয় সম্প্রদায়ের সমাগম ঘটে। পৌষমাসব্যপী চলা মেলায় বহু পরিবারের পেট চলে। এই মেলা সকল ধর্ম-এর মহামিলন ক্ষেত্র। এই মন্দিরেই সর্বপ্রথম পশুবলি নিষিদ্ধ হয়। বর্তমানে দেবীর নামে মানত করে সেই পশুটিকে কেবল পুজার অঙ্গ হিসেবে উৎসর্গিত হয়, হত্যা করা হয় না।

বলা হয়, মাকালী দিনের শেষে শয়ন গ্রহণ করেন ১১৬৬ অব্দের ১লা বৈশাখে তৎকালীন কাশিমবাজারের গোমস্তা কৃষ্ণচন্দ্র হোতা কর্তৃক স্থাপিত সৈদাবাদের দয়াময়ী কালীবাড়িতে।[১৫] লোকশ্রুত নির্বিঘ্ন নিদ্রার জন্য দেবী এখানে কখনই বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করতে দেন না। মন্দির কমিটি যতবারই এ বিষয়ে চেষ্টা করেছেন ততবারই কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটায় দেবীর গর্ভগৃহ কেবল প্রদীপ-মোমের শিখার আলো-আধাঁরির মধ্যে থাকে। ঘুমের শহরে যাওয়ার আগে চারিদিকের আলো-শব্দ বন্ধ করে যেমন মনুষ্যকূল ঘুমাতে যান তেমনি দেবীও যেন সেই ঘুমের দেশের মত নিঃঝুম পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। টেরাকোটার দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটি জোড়বাংলা বিশিষ্ট। এক্ষেত্রে স্থায়িত্বকে দীর্ঘায়িত করার জন্য দুটি দোচালাকে জোড়া দেওয়া হয়েছে। মন্দির গাত্রে টেরাকোটার অলঙ্করণের মধ্য দিয়ে সতীর দেহত্যাগের চিত্র ফুটে উঠেছে।

মুর্শিদাবাদের আরেক অন্যতম কালীক্ষেত্র আধুনিকতায় পরিপূর্ণ কান্দির দোহালিয়া জনপদটি একসময় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১১৪০-১১৪১ সালে ব্যাসসিংহের পুত্র বনমালী সিংহ যাবতীয় বনজঙ্গল কেটে পরিষ্কার করে সেটিকে অর্থাৎ কান্দিকে জনপদের রূপ দেন।[১৬] অবস্থিত আজ থেকে প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে রাজা লক্ষণ সেন ও বল্লাল সেন দ্বারা এই দক্ষিণাকালীবাড়ীটি নির্মিত হয়।[১৭] এই মন্দির ঘিরে রয়েছে বহু জনশ্রুতি। বলা হয়, কোনো এক পরিব্রাজক জলপথে এই অঞ্চল দিয়ে নাগাল্যাণ্ডে যাওয়ার সময় এস্থানে তপস্যা করেন। আবার বলা হয়, সাধক বামাখ্যাপা এই মন্দিরের পঞ্চমুণ্ডির আসনে বসে সাধনা করার সময়ে দেবীর অপূর্ব রূপ দর্শন করেন। আরো শোনা যায় কোনো এক সাধক এই মন্দির লাগোয়া এক গাছের নীচে বসে কঠোর তপস্যা করেন এবং তাঁর তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে দেখা দেন ও বর প্রার্থনা করতে বলেন। সাধক তখন জানান, যেহেতু তিনি অন্ধ সেহেতু সকল অন্ধমানুষ যেন অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পান। সেই থেকে এলাকাবাসীর বিশ্বাস এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মনুষ্যজনকে অন্ধত্ব ও চোখের বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে মুক্তি দেন। এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ব্রাম্ররুপী শিলা। তাঁকে সেবাইতরা নিপুণ হাতে শাড়ি পরান। দেখে মনে হয় ঘরের মেয়ে সেজেগুজে বসে আছে। দেবীর মন্দির এক রত্ন বিশিষ্ট আটচালার ও সম্মুখভাগে সমতল ছাদবিশিষ্ট নাটমন্দির তিনটি প্রবেশপথ যুক্ত। এই দেবীমাকে ঘিরে এলাকাবাসীর আলাদা আবেগ জড়িত। হিন্দু–মুসলিম উভয়েই যেন দেবীর সন্তান। প্রতি বছর দীপান্বিতা অমাবস্যায় সারা গ্রামে শুধুমাত্র এই দেবীকালী পূজিত হন। এই সময়ে ও মাঘী পূর্ণিমায় এই কালীবাড়ীতে বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। উভয় সম্প্রদায় মা'র কাছে তাঁদের মনোবাসনা নিয়ে মানত করেন, পূজা দেন। মুসলিমদেরও দেখা যায় অন্ধন্ত থেকে মুক্তি লাভের জন্য দেবীর নিকট সাধ্যমত মানত করেন ও তাঁদের কথা অনুয়ায়ী সেই মানত পূর্ণতা পায়। সকল দেবস্থানে দেবদেবীর চরণামৃত পান করতে দেখা গেলেও এই দোহালিয়া কালীবাড়ীতে দেখা যায় দেবীর চরণামৃত ভক্তি ভরে চোখে দিতে, বিশ্বাস এতে চোখের সমস্ত সমস্যার সমাধানে ঘটবে। এই উপলক্ষে সারাবছর হিন্দুদের পাশাপাশি ইসলাম ধর্মাবল্মবীদের ভিড় দেখা যায় তা প্রমাণ করে দেবীর নিকট কোনো জাত-ধর্ম মান্যতা পায় না, মান্যতা পায় কেবল মানবধর্ম।

মুর্শিদাবাদের ভাগীরথীর নদীর পশ্চিমপারস্থ লালবাগ সদরের ওপর প্রান্তে অত্যন্ত নয়নাভিরাম অঞ্চল ডাহাপাড়া নিকটস্থ জিয়াগঞ্জে সতীর এক উপপীঠ কিরীটেশ্বরী। জনশ্রুতিনুসারে এখানে দেবী সতীর কোনো দেহাঙ্গ নয়, কেবলমাত্র কিরীট বা মুকুট পতিত হওয়ায় এই কালীক্ষেত্র পীঠের মর্যাদা পায়নি। রিয়াজুস-সালাতীন ও রেনেলের কাশিমবাজার দ্বীপের মানচিত্রে চিহ্নত 'তীরতকোণা' নামে খ্যাত এইস্থানে দেবীর দুটি মন্দির।[১৮] প্রথমে মন্দিরের গঠনশৈলীর প্রতি দৃকপাত করা যাক। গুপ্তমঠ নামক প্রাচীন মন্দিরটি ও কিরীটেশ্বরী মন্দির, শিব ও ভৈরব মন্দির নির্মাণ করেন জমিদার দর্পনারায়ণ। মন্দিরের গর্ভগৃহে এক উচ্চবেদি ও তার পশ্চাতে একবিশাল শিলাখণ্ড নানারূপ নয়নাভিরাম শিল্প কারুকার্য, বেদিটি কৃষ্ণমর্মর প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। মূল মন্দিরের চারিপাশে অসংখ্য শিব মন্দির রয়েছে। শিবমন্দিরে মধ্যে কৃষ্ণপাথর দ্বারা নির্মিত শিবলিঙ্গ ও ভৈরব মন্দিরে কষ্টিপাথর দ্বারা নির্মিত ভৈরবমূতির অবস্থান ছিল। এই ভৈরব ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি।মন্দিরের সম্মুখে জমিদার দর্পনারায়ণ রায় 'কালীসাগর' নামে একটি বিশাল পুকুর খনন করে দেন। তবে ১৪০০ খ্রিঃ মূল মন্দিরটি ধবংস প্রাপ্ত হয়। এরপর তা নতুন ভাবে নির্মিত হয়। নবাব সিরাজ-উদ্দোলার সময় থেকে কোম্পানির শাসন পর্যন্ত শিবনারায়নের পুত্র লক্ষীনারায়ণ দেবীর সেবা যত্ন করতেন।[১৯] পরবর্তী সময়ে নবনির্মিত মন্দিরটি ক্ষয় প্রাপ্ত হলে কাশিমবাজারের মহারাজ মনিশচন্দ্র এই কিরীটেশ্বরী মন্দির সংস্কারসাধন করেন। তাঁর পরবর্তী সময়ে তাঁর বংশধরদের উপর এই মন্দির সংস্কারের দায়িত্ব পড়ে। এখানে দেবী বিমলা ও ভৈরব সম্বত নামে পরিচিতা। পূর্ণচন্দ্র মজুমদারের মতে,

> "Old Kriteswari did not escape the influence of Buddaism, for one finds the image of Budda, in the usual sitting posture medition, located in one of the temples close by and now worshipped as an image of Bhoirab."[২০]

একটি মন্দিরে পিতলের দেবীমূর্তিটির মাথায় রূপার মুকুটসহ সারাশরীরে নানারূপ আভরণ-এ পরিহিতা হয়ে ষোড়শী কিশোরী রূপে পিতলের সিংহাসনে উপবিষ্টা। ঠিক পাশেই দেবীর গর্ভগৃহসহ মূল মন্দির অবস্থিত। সেখানে শিলা স্বরূপ

দেবী ভক্তদের দ্বারা উৎসর্গিত নারকেলের জল দ্বারা অভিসিক্ত ও তেল-সিঁন্দূর-ফুল দ্বারা পূজিত হন। প্রতিবছর পৌষমাসে এই শিলাখণ্ডটি বিশেষভাবে সজ্জিত হয়ে রাত্রিকালীন সময়ে বিশেষভাবে পুজিত হন। এখানে দেবী তান্ত্রিক মতে পুজিত ও পুস্পাঞ্জলির মন্ত্র অন্যান্য দেবদেবীর থেকে অনেকটাই আলাদা। এই দেবীর পুজা দিলে অকালমৃত্যুর হাত থেকে পরিবারকে রক্ষা করা যায়। জানা যায় নবাব মীরজাফর কুষ্ঠরোগের হাত থেকে মুক্তি পেতে এই দেবীর চরণামৃত পান করেন।[২১] বর্তমানে মন্দির উন্নয়ন কমিটিতে স্থানীয়-হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ রয়েছেন। অতি-সাম্প্রতিককালে এই মন্দিরের উদ্দেশ্যে স্থানীয় পাঁচ ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ জমি দান করেন।[২২] ইতিপূর্বে স্থানীয় তকিমুন নেসা নামে এক মুসলিম নারীর ইচ্ছানুসারে তাঁর স্মৃতিতে তাঁর পরিবার মন্দিরের উদ্দেশ্যে তিন শতক জমি দান করে মানবতা-সম্প্রীতি-ধর্মীয় প্রেমের অনন্য নজির রাখেন।[২৩]

মুর্শিদাবাদের কালীক্ষেত্র হিসেবে যে সপ্ত-কালীবাড়ীর সামান্য আলোচনা করা হল সেগুলোর প্রত্যেকটিতে দেবীর প্রার্থনা-আরাধনা থেকে দেবীর মন্দির উন্নয়নে হিন্দু-মুসলিম উভয়েই একযোগে এক প্রাঙ্গণে সামিল হন। এমনকি মন্দিরগুলি দূর থেকে দেখলে বিশেষ করে চূড়াগুলো দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব যে সৌধটি মন্দির নাকি মসজিদ। ঝাঁ-চকচকে উচ্চপদস্থ এলাকাবাসীর কাছে এই জেলা এক নজির স্থাপন করে। প্রায় নিরক্ষর এই জেলার অধিবাসীদের মননে শিল্পবোধ কি আছে? নাকি জলাজঙ্গলে কয়েকটা ইট-বালি-সিমেন্ট দিয়ে মন্দির নির্মাণ করে হিন্দুকেন্দ্রীকতার মধ্যে নম নম করে পূজা সারা হয়? এই সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিতে তথা মুর্শিদাবাদকে হিন্দু-মুসলিমের মিলন ক্ষেত্রে পরিণত করতে মা'কালী যেন কোনো কার্পণ্য করেননি। বহুমাত্রিক ভারতবর্ষে মন্দির-মসজিদ নিয়ে যেমন উচ্চ সংস্কৃতি তৈরি হয়েছে তেমনি এই উপাসনা গৃহগুলিকে কেন্দ্র করে সাম্প্রদায়িক হানাহানি বেঁধেছে। এই জেলার ব্রহ্মময়ী কালীবাড়ীও-এর ব্যতিক্রম নয়। তবে নির্মাণ শৈলীর উৎকর্ষতা ও আঙ্গিক ভুলিয়ে দেয় সবকিছু, নত করে মস্তক। গবেষকদের মতানুসারে ঋকবেদে উল্লেখিত রাত্রিদেবী প্রকৃত অর্থে দেবী কালী। কালীর অর্থ জ্ঞান, ভাগ্যবান, আনন্দদায়িনী, উদারতা, সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব। মুর্শিদাবাদের সপ্ত কালীক্ষেত্র-এ দেবী কালীর প্রতিটি রূপ যেন তারই প্রমাণ। মন্দির কেবল পুজার্চনার স্থান নয়। নির্মাতা ও তাঁর নিকটজনের মুক্তি মার্গের আল, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়কে শোধন করে আত্মার উন্নয়ন সাধনের স্থান যেমন এই কালীক্ষেত্র তেমনি পারস্পরিক ভরসা, বিশ্বাস, প্রেম, ভালবাসা, শ্রদ্ধা-এসমস্ত কলা সকলের মধ্যে যদি দৃঢ়ভাবে সকল মানব মনে অবস্থান করে তবে কোনো ঝড় কোনো অশুভ শক্তি সেই মানববন্ধনকে আলগা করতে পারে না তা প্রমাণ করে। মুর্শিদাবাদের হিন্দু-মুসলিম প্রতিটি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভরসা, প্রেম যে কতখানি গভীর তার নজির আলোচ্য আলোচনায় দেখা যায়। কৃপাময়ী-করুণাময়ীকে ঘিরে যেমন দুই ধর্মের মানুষ আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে, ব্রহ্মময়ীর নিকট দুই ধর্মই তাঁদের মননকে জ্ঞান-সততা-উদারতায় ভরিয়ে তোলার ভিক্ষা চায়, দোহালিয়ার নিকট মানুষ তাঁদের চারিপাশের জগতকে প্রাণভরে দুচোখ দিয়ে দেখার আকুল আবেদন জানায় তেমনি জয়কালী, কিরীটেশ্বরীকে মনের মত করে সাজাতে হিন্দু-মুসলিমের মিলিত উদ্দ্যোগ চোখে পড়ার মত। এমনকি যেখানে AI-এর আগমন ঘটেছে যার কবলে পড়ে বেকারত্বের হার কত শতাংশ বাড়বে তা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে বিবাহের ক্ষেত্রে এখনও জাত-পাতের মত নগণ্য বিষয়ের রমরমা বেঁচে আছে। সেখানে বিধর্মীতে বিবাহ করে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করার বহু নজির রয়েছে এই 'নিরক্ষর' মুর্শিদাবাদে। হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও শিল্প-সংস্কৃতি সমন্বয়ে ইসলাম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের সপ্ত-কালীক্ষেত্র-এর স্বার্থকতা এখানেই। মন্দির নির্মাণ শৈলীতে যেমন বাংলার নিজস্ব রীতিকে অনুসরণ করে মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছে। অন্যদিকে দেখিয়েছে শিল্প বলতে কেবল বড় বড় কারখানা, অট্টালিকা বোঝায় না কিংবা সংস্কৃতি বলতে কেবল কৃষ্টিকে বোঝায় না, আসল শিল্প বা কলা হল মানবপ্রেম, আসল সংস্কৃতি হল পারস্পরিক ভালবাসা-প্রেম-মাধুর্য-সম্মান-শ্রদ্ধা। পুঁথিগত জ্ঞান, চলাফেরায় চাকচিক্য এদিকে আচারনে হিংস্রতা থাকলে তাকেই আপাত নজরে 'সুশিক্ষিত' বলা যায়। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা-স্বাবলিলতা লুকিয়ে রয়েছে মানব-সম্প্রীতিতে। সর্বধর্ম সম্প্রীতি মানববন্ধনের ক্ষেত্রে এক অমূল্য কলা, প্রকৃত শিক্ষা। ৪৭-এর দেশভাগ, ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ, খানসেনা-রাজাকার, ১৯৯৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর কান্দাহার বিমান অপহরণ, ২০১৬ সালে ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ২০১৯-এ বালাকোট বিমান হামলা, ভারতীয় কম্যান্ডার উইঙ্গ অভিনন্দনকেপাকিস্তান দ্বারা আটক

থেকে ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলা নিয়ে উন্মাদনা - এই সমস্ত বহু ঘটনা আমাদের মনে বিশ্বাস সৃষ্টি করে হিন্দু-ইসলামের মধ্যে কোনো প্রেমপূর্ণ সম্প্রীতি থাকতে পারে না। যেখানে জেলার মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৭% মুসলিম, ২২% হিন্দু, ১% অন্যান্য সম্প্রদায়, রাজ্যের অন্যান্যংশ থেকে মুর্শিদাবাদে হিন্দু উৎসবের তুলনায় প্রায় প্রতিটি পরব ধুমধামের সাথে পালিত হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে ইসলাম অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদের সপ্ত-কালীক্ষেত্র যেমন মন্দির নির্মাণ শৈলিতে অনন্যতার পরিচয় দিয়েছে তেমনি মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে প্রকৃত সংস্কৃতি ও স্বাক্ষরতা তথা সুশিক্ষার পরিচয় দিয়েছে। জেলার সপ্ত-কালীক্ষেত্র প্রমাণ করে যে ধর্ম-সংস্কৃতি-শিল্প আলাদা কিছু নয় - এরা এক সুতায় গাঁথা, যা মানবশক্তি নামে খ্যাত। যা শুধু ভারত নয় সমগ্র বিশ্বের নিকট নজির সৃষ্টি করে।

Reference :

১. চন্দ্র, অরুপ, মুর্শিদাবাদ ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় খণ্ডঃঃ মুপ্রাচীন ও মধ্য পর্ব, বাসভূমি প্রকাশন, ১লা সেপ্টেম্বর ২০১৬, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পৃ. ৩৬৭
২. হালদার, মঞ্জু, প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয়-সংস্কৃতি বিবর্তনের ধারা, উর্বী প্রকাশনী, জানুয়ারি ২০১৩, পৃ. ১৭
৩.তদেব, পৃ. ২৩
৪. দে, নন্দিনী, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে জেলা মুর্শিদাবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৪০
৫. তদেব
৬. ঘোষ, নীহার, বাংলার মন্দির শিল্পশৈলী (অন্ত মধ্যযুগ), অমর ভারতী, ১৫ আগস্ট ২০১২, কলকাতা-৭০০০০৯, পৃ-৫৫
৭. তদেব, পৃ. ৮৫-৮৬
৮. সাঁতরা, তারাপদ, কলকাতার মন্দির-মসজিদ স্থাপত্য-অলংকরণ-রূপান্তর, আনন্দ পাবলিশার্স, মে ২০১৯, পৃ-১৬
৯. সাক্ষাৎকার – শান্তনু চ্যাটার্জি (বর্তমান পুরোহিত), বয়স-৬৭ গ্রাম- কাশিমবাজার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, তাং- ০৩/০১/২০২৩
১০. ঐ
১১. ঐ
১২. সাক্ষাৎকার- ফণীভূষণ ভট্টাচার্য, (স্থানীয় বাসিন্দা), বয়স- ৭৩, গ্রাম- ভাটপাড়া, জেলা মুর্শিদাবাদ, তাং-০৩/০১/২০২৩
১৩. সাক্ষাৎকার – জনার্দন ঠাকুর (বর্তমান পুরোহিত), বয়স-৬৭, গ্রাম– গোয়ালজান, জেলা- মুর্শিদাবাদ, তাং- ৯/৯/২০২৩
১৪. দে, নন্দিনী, বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহ্য ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়ে জেলা মুর্শিদাবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ৫৬
১৫. তদেব, পৃ. ৫৬
১৬. চক্রবর্তী, লক্ষ্মীনারায়ণ, মুর্শিদাবাদের আঞ্চলিক ইতিহাস,২৫শে বৈশাখ,১৪১৯, শিল্পনগরী, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পৃ. ৫
১৭. তদেব

১৮. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড, দীপ প্রকাশক, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ২১

১৯. রায়, নিখিলনাথ, মুর্শিদাবাদ কাহিনী, পুঁথিপত্র (ক্যালকাটা) প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ৪

২০. ঘোষ, বিনয়, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, তৃতীয় খণ্ড, দীপ প্রকাশক, জানুয়ারি ২০২০, পৃ. ২৩

২১. আনন্দবাজার অনলাইন, ১৩ই, নভেম্বর, ২০২০

২২. Chanal Hindustan Exploring Digital India, 24/04/2018

২৩. তদেব